তারিখ ... 03 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

মাছুম বিল্লাহ

পাবলিক পরীক্ষায় ভালো করাই যথেষ্ট নয়

২০১৫ সালের শেষদিনে একই সঙ্গে প্রকাশিত হল পিইসি, জেএসসি ও সমমানের পরীক্ষাগুলোর ফল। আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা ক্রমাগত ভালোর দিকেই এগোচ্ছে, আর এটিই স্বাভাবিক। পৃথিবী এগোচ্ছে, আমাদেরও এগোতে হবে। পরীক্ষার ফল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়, অভিভাবক সবার জন্য বিরাট এক আনন্দ নিয়ে আসে। আর এ আনন্দ আমাদের এক ধরনের বার্তা দিচ্ছে : শুধু পরীক্ষাতেই ভালো করতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলে জানা যায়, যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থীরা এখন আর বাইরের, আনন্দের, গল্পের, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে জানার বইপুস্তক পড়ছে না। পরীক্ষা, পরীক্ষায় ভালো করা, পরীক্ষার প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয় তাদের অন্য বই পড়তে দিচ্ছে না। অভিভাবকরাও চাচ্ছেন না বাইরের বই পড়ে তাদের ছেলেমেয়েরা সময় নষ্ট করুক। আসলে কি তাই? বাইরের বই পড়লে শিশুদের সময় নষ্ট হয়? মোটেই না, বরং তাতে জ্ঞানের পরিধি বাড়ে।

আমাদের শিক্ষানীতিতে পাবলিক পরীক্ষা ছিল দুটো। সেটি না মেনে আমরা চারটি পরীক্ষা চালু করেছি। ফলে শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টরা প্রকৃত জানা, মূল্যায়ন থেকে দূরে সড়ে গিয়ে শুধু পরীক্ষায় ভালো করার অর্থাৎ ফল প্রদর্শনীর খেলায় মেতেছে। এ পরীক্ষাগুলোতে আরেকটি মাতামাতি ছিল : 'সেরা বিদ্যালয় নির্বাচন'। দেশের, বিভাগের, জেলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ণয় ইত্যাদি গতবার থেকে বাদ দিয়েছে সরকার।

সমাপনীতে সাতটি বিভাগের মধ্যে পাসের হারের দিক থেকে এগিয়ে আছে রাজশাহী বিভাগ। এ বিভাগে পাসের হার ৯৯ শতাংশ। সবচেয়ে কম পাসের হার সিলেট বিভাগে, ৯৬.৭৯ শতাংশ। অপর পাঁচটি বিভাগে ৯৮ শতাংশের কম-বেশি। জেলা হিসেবে সবচেয়ে ভালো করেছে মুন্সীগঞ্জ। এ জেলার সব শিক্ষার্থীই পাস করেছে আর সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বরগুনা। ধরন অনুযায়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, যেগুলোতে প্রাথমিক শাখা আছে, সেগুলোর ফল সবচেয়ে বেশি ভালো হয়েছে। এটি একটি গবেষণার বিষয়, সম্ভবত উচ্চমানের শিক্ষক সেখানে আছেন। এসব বিদ্যালয়ে গড়ে পাসের হার ৯৯.৯৭ শতাংশ। এতদিন প্রাথমিক শিক্ষা ইনস্টিটিউটসংলগ্ন (পিটিআই) পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পাসের হার বেশি হতো। এবার তারা দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে গড় পাসের হার ৯৮ থেকে ৯৯ শতাংশের মধ্যে। এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মানসম্মত গবেষণা দরকার, যার ফল শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভালোভাবে অবহিত করা দরকার। কেন একেক বছর একেক এলাকার শিক্ষার্থীরা হঠাৎ করে বেশি ভালো করে আবার বেশি খারাপ করে, যা দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে আলাদা হয়?

পাসের হার ও জিপিএ-৫ গতবারের চেয়ে বেড়েছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল গতবারের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এ বোর্ডে পাসের হার ৯৮.৫২ শতাংশ ছিল গতবার, এবার তা হচ্ছে ৯৭.৯২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৮০। মোট পরীক্ষার ৯.৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার পেয়েছিল ২ লাখ ২৪ হাজার ৪১১। গতবার (২০১৪) প্রাথমিকে শতকরা একশ' ভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৫৭, এবার তা বেড়ে হয়েছে ৯১ হাজার ২২৭। শূন্যভাগ পাস করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবারও ১৫৩। এতকিছুর পরও এখনও পাসের হার শূন্য থাকা বিদ্যালয় রয়েছে, যা আমাদের অনেক কিছুর অপারগতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, এসব বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্টদের সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় গতবার জেএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছিল। এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই বেড়েছে। পাসের হার ২.৫ শতাংশ আর জিপিএ-৫ গতবারের ৫০ হাজার ৫৫৭ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৭ হজার ৫০২। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ১৯ লাখ ২৯ হাজার ৯৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৭ লাখ ৮০ হাজার ৭৭০ জন। এবার গণিতে শিক্ষার্থীরা গতবারের চেয়ে ভালো করেছে। জেএসসিতে সেরা রাজশাহী (৯৭.৪৭), সবচেয়ে পিছিয়ে চট্টগ্রাম বোর্ড (৮৫.৪৮ শতাংশ) মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, এবার প্রথমবারের মতো চালু হওয়া বাংলা, ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শারীরিক শিক্ষা/কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়ের প্রতিটিতে পূর্ণমান ৫০-এর মধ্যে আলাদা করে ৪০ নম্বর না পেলে

জিপিএ-৫ ধরা হয়নি, ফলে জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা এবার কমেছে।

২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সময় কোনো রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ ছিল না। গতবার শিক্ষার্থীরা অনেক আতংকের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে। এবার তারা নিরুদ্বেগে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দিয়েছে। গণিতে প্রথমবারের মতো সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় গতবার পাসের হার কম ছিল। এ বিষয়ে সরকার প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও আওতা বাড়িয়েছিল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও বিষয়টি আয়ত্ত করার সময় পেয়েছে, তাই গণিতে এবার ভালোই করেছে শিক্ষার্থীরা, যা পুরো ফলকে প্রভাবিত করেছে। ব্যাপকভাবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল গতবারের পরীক্ষার সময়, যা শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। এবারকার পরীক্ষা এ থেকে মুক্ত ছিল বলে শিক্ষার্থীরা অনেকটা মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা দিতে পেরেছিল। রাজনৈতিক গণ্ডগোল না থাকা এবং প্রশ্নফাঁস না হওয়া আমাদের আনন্দের বার্তার কথা বলছে।

ভালো ফলের মানদণ্ড নির্বাচনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দশটি সূচক নির্ধারণ করেছে। এগুলো হচ্ছে— ১. অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, ২. পাস করা শিক্ষার্থী, ৩. ফেল করা শিক্ষার্থী, ৪. পাসের হার, ৫. জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী, ৬. শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান, ৭. শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান, ৮. বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা, ৯. কেন্দ্র সংখ্যা এবং ১০. প্রতিষ্ঠান সংখ্যা। এগুলোর মধ্যে একটি সূচক ছাড়া বাকিগুলো ইতিবাচক। তবে আরেকটি সূচক এখানে যোগ করা যেত। সেটি হচ্ছে, একটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করার পর কতজন শিক্ষার্থী পরবর্তী ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পেরেছে। কেবল বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে এবার (২০১৫-এর ফল) সাতজন বেশি। এবার চট্টগ্রাম, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ডের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে গতবারের চেয়ে খারাপ করেছে, তা না হলে ফল আরও ভালো হতো বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। এবারের আরেকটি পজিটিভ সূচক হচ্ছে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পাসের দিক থেকে এগিয়ে আছে। আমাদের ক্ষুদে শিক্ষার্থী তথা ভবিষ্যৎ যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাই তাদের এ সাফল্যের জন্য। সেই সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবক যারা শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সিস্টেম যেহেতু পরীক্ষার, পড়াশোনা যেহেতু পরীক্ষানির্ভর— শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সেটি তো মানতেই হবে।

তারপরও দু-একটি কথা না বললেই নয়। পরীক্ষায় পাস বা ভালো গ্রেড পাওয়াকেই প্রকৃত মূল্যায়ন এবং প্রকৃতি শিক্ষা অর্জন বোঝায় না, যা আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বুঝতে হবে। হ্যাঁ, পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো করতে হবে। ভালো করার জন্য শুধু পরীক্ষানির্ভর পড়া যেন আমরা না পড়ি বা না পড়াই। শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগোতে হবে। তার মধ্যে আসবে পরীক্ষা, প্রচলিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন। এক্ষেত্রেও ভালো করতে হবে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, পরপর কয়েকটি পাবলিক পরীক্ষায় অনেক ভালো করেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীদের কী হয়েছিল। এ অবস্থাটি আমাদের বার্তা দিচ্ছে, শুধু পাবলিক পরীক্ষায় ভালো করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কোচিং ও গাইডের ব্যবহার কি কমেছে? বরং বেড়েছে। তাহলে কেন সৃজনশীল প্রশ্ন চালু করা হল? প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আমরা তো এখনও ট্রাডিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেছে বেছে পড়লেই তো ফল ভালো করা যায়, তাহলে পুরো বই শিক্ষার্থীরা কেন পড়বে আর কমার্শিয়াল শিক্ষকরাইবা তার বাইরে যাবেন কেন?। গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যদি এক বোর্ডে সেট করা হয়, তো দেখা যায় বছরের পর বছর ওই একই প্রশ্ন বিভিন্ন বোর্ডে চলতে থাকে। দেখার যেন কেউ নেই। কিছুদিন আগে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের বেশ ক'জন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হলে তারা এ সম্পর্কে অতটা অবগত নন বলে জানান। কেউ কেউ বলেন, প্রশ্ন তো তারা করেন না, শিক্ষকরাই করেন, অতএব এ দায়-দায়িত্ব তাদের নয়। আমার প্রশ্ন, বিষয়টি কি তারা এড়িয়ে যেতে পারেন? শিক্ষার্থী মূল্যায়নের মূল কাজটি শিক্ষা বোর্ডগুলোই করে থাকে, সেখানে প্রকৃত স্বচ্ছতা ও যথার্থতা থাকতেই হবে।

মাছুম বিল্লাহ : *শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক*
masumbillah65@gmail.com